১

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

মিজানুর রহমান খান

এই অধ্যায়ে প্রথমত পরীক্ষা করা হয়েছে জরুরি অবস্থা জারি থাকার ফলে এর দ্বারা কীভাবে বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রভাবিত হয়েছে, বিশেষ করে দুর্নীতিবিরোধী গতিধারা কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে ধাবিত হয়েছে। ২০০৮ সালে বিচার বিভাগ, পুলিশ, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি এবং নতুন স্থাপিত কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন- মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে তা এখানে আলোচিত হয়েছে। যদিও বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে কতিপয় পরিবর্তন হয়েছে দীর্ঘদিনের দাবির ফলস্বরূপ কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক এসব পরিবর্তন হয়েছে হিতে বিপরীত। যেমন- আদালত অবমাননা আইন অথবা নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগের বিধান দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কিন্তু নতুন আইন প্রণয়নের পর দেখা গেল এসব আইনের বিধান এবং প্রণয়নের পদ্ধতি উভয়ই ত্রুটিপূর্ণ।

বিচার বিভাগের ওপর জরুরি অবস্থার প্রভাব

যদিও সংবিধানের ১৪১ক ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি পরবর্তী সংসদ অনুমোদন দেয় তাহলে জরুরি অবস্থা সর্বোচ্চ ১২০ দিন চলতে পারে, কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রায় দুই বছর যাবৎ সংসদের অনুপস্থিতিতেই জরুরি অবস্থা জারি রাখে। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্বে ১৭ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়।

জরুরি অবস্থা জারি থাকার ফলে সুনির্দিষ্ট কিছু সাংবিধানিক অধিকার স্থগিত থাকে। সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে এসব অধিকার বলবৎ করার সাংবিধানিক অধিকারও স্থগিত করা হয়। এতে জনগণের বিচারপ্রাপ্তির অধিকার ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। তবে ২০০৮ সালে বিচারপ্রাপ্তির অধিকারের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে তথাকথিত 'ভিআইপি' বন্দিদের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত বন্দিদের বেলায় হাইকোর্ট যেন পরপর আদেশ দানের স্রোতধারা প্রবাহিত করেছিল। রিট হোক কিংবা ফৌজদারি হোক হাইকোর্ট রাজনৈতিক বন্দিদের মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্দিদের জামিন দেন। হাইকোর্টের এরূপ অবস্থান কাকতালীয়ভাবে সরকারের মনোভাবের সাথে মিলে যায় যখন সরকার ঘোষণা করে যে, তারা প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ও এর নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক পুনর্স্থাপন করতে যাচ্ছে। কারণ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তারা উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে চায়। সরকারের এরূপ মনোভাব কঠোরভাবে সমালোচিত হয় এবং বলা হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে অবস্থান তা থেকে সরকার পিছু হটেছে।

দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা

ঢাকার শেরে বাংলা নগরে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল দুর্নীতির মামলা দ্রুতগতিতে শুনানি করলেও ঢাকার বাইরে এসব মামলার প্রতি মনোযোগ ছিল কম। সূত্র মতে, ২৬ নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন বিচারিক আদালতে ১১২ জন এবং দেশের অবশিষ্ট এলাকায় ৫ জন দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত ও দোষী সাব্যস্ত হয়।[১] এই সময় পর্যন্ত জরুরি বিধিতে ৪১ জন দণ্ডিতের আপিল হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন ছিল। পেপারবুক (মামলার নথির সব কাগজ দিয়ে তৈরি বই) ছাড়া এসব আপিলের শুনানির কোনো সুযোগ নেই; কিন্তু দুদক নিজ উদ্যোগে কেবল তিনটি পেপারবুক তৈরি করে সম্ভবত এই ভয়ে যে, হাইকোর্ট অভিযুক্তদের যেভাবে গণহারে জামিন দিচ্ছে সেভাবেই গণহারে দণ্ডিতদের খালাস দিতে পারে। অন্যদিকে রাজনৈতিক হাওয়া বদল হতে পারে এই অপেক্ষায় দণ্ডিতরাও আপিল শুনানির জন্য কোনোরকম আগ্রহ দেখায়নি। বছর শেষে দেখা গেল, দুর্নীতির অভিযোগে খুব অল্পসংখ্যক 'ভিআইপি'

---

১ লেখকের কাছে সংরক্ষিত নথি।

দণ্ডিত হয়েছে এবং বেশিরভাগ দণ্ডিতরাই জামিন পেয়েছে। দু'একজন আবার আপিল বিভাগের চেম্বার জজের কাছ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ নিয়ে শেষ মুহূর্তে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছে।

কিছু কিছু মামলায় যেভাবে জামিনের আদেশ দেয়া হয়েছে তাতে জনমনে প্রশ্নের উদ্রেক করে। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে মাত্র একটি বেঞ্চেই জরুরি আইনে অভিযুক্ত ৭৬ জনকে জামিন দেয়া হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে দেখা যায়, এসব জামিন আদেশের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সামঞ্জস্যও ছিল না।[২]

বক্স ১.১ : ৩১৫ মিনিট, ২৯৮ মামলা
হাইকোর্ট বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চে ২৮ আগস্ট ৩১৫ মিনিটে ২৯৮টি মামলার আদেশ দেয়া হয়। এর মধ্যে কিছু মামলা দুদক কর্তৃক জরুরি আইনে দায়েরকৃত হলেও বেশিরভাগই ছিল সাধারণ ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত। অভিযোগপত্রে নাম আছে এমন কিছু ব্যক্তিকেও আগাম জামিন প্রদান করা হয়েছে, যা শুধু নজিরবিহীনই নয় বরং অস্বাভাবিকও। হাইকোর্টের এক বেঞ্চে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন বিবেচনাধীন থাকলে তা অন্য বেঞ্চে স্থানান্তর না করার যে প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ ছিল, সেখান থেকেও অনেক মামলা সরে আসতে দেখা গেছে।[৩]

১১ জানুয়ারি ২০০৭-এর পূর্বে সংঘটিত অপরাধ জরুরি বিধিমালার আওতায় আসবে না– এই অজুহাতে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত অনেক রাজনীতিবিদ হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেন। তবে সাংবিধানিক অধিকার বলবৎকরণে হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রত্যাহারে জরুরি বিধিমালা সরকারকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করেনি।[৪]

সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্টে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারক নিয়োগ করার বিষয়টি সরাসরিভাবে বিচার বিভাগ পৃথককরণ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত। হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগে সুপারিশ করার জন্য প্রধান বিচ-

২ 'দুর্নীতির মামলায় এক বেঞ্চেই এক মাসে ৭৬ জনকে জামিন', *প্রথম আলো,* ২০ আগস্ট ২০০৮।

৩ মিজানুর রহমান খান, '৩১৫ মিনিটে ২৯৮ মামলার আদেশ', *প্রথম আলো,* ৯ নভেম্বর ২০০৮।

৪ আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিক সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ারপতির নেতৃত্বে আইন সচিবসহ নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করা হয়েছে। ব্যাপক সমালোচনার মুখে সুপ্রিম জুডিশিয়াল আইন সংশোধন করে কমিশনকে পুনর্গঠিত করা হয়। সংশোধনের পূর্বে এই কমিশনে বিচার বিভাগের তুলনায় নির্বাহী বিভাগেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। যা হোক, বর্তমান সংশোধিত কমিশনেও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা একেবারেই কম নয়। আইন মন্ত্রণালয়ের হাতেই বর্তমানে সম্ভাব্য বিচারকদের খসড়া তালিকা তৈরির দায়িত্ব অর্পিত আছে। তাছাড়া সরকার ইচ্ছা করলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশনের সুপারিশ পাশও কাটাতে পারে। বছরের শেষ দিকে হাইকোর্ট বিভাগে কিছু নতুন বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি (যিনি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশনেরও সদস্য) এই নিয়োগ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে হয়নি বলে মত দেন এবং এরূপ নিয়োগে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[৫]

একইভাবে সরকার স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন। চরম বিতর্কিত হয়ে তারা ২০০৭ সালের প্রথম দিকে পদত্যাগ করেন। সূত্র মতে, এ বছর কতিপয় বিচারপতিকে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তাদের পদত্যাগ করার অনুরোধ জানানো হয়, এদের মধ্যে একজন পদত্যাগ করেন।[৬]

নিম্ন আদালত

২০০৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও বাস্তবে কিছু কিছু বাধার কারণে এখনো বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন হয়নি। বাধাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– এখনো নিম্ন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলি আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত। উদাহরণস্বরূপ, বিধি অনুযায়ী সলিসিটর নিয়োগ পাওয়ার কথা জেলা জজদের মধ্য থেকে কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় বিচার বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন একজন ব্যক্তিকে সলিসিটর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। অধিকন্তু আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে যে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিচারকদের প্রমোশন হতো, তা এখনো বহাল আছে। তাছাড়া বিচারকদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত দায়িত্ব এখনো সরকারি কর্মকর্তাদের হাতে। উদাহরণস্বরূপ, সুপ্রিম কোর্ট ঢাকার

৫ লেখকের কাছে সংরক্ষিত নথি।
৬ *প্রাগুক্ত।*

জেলা জজ এবং নারায়ণগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় শুধু জেলা জজের বিরুদ্ধে তদন্তের উদ্যোগ নেয়।[৭]

১৬ নভেম্বর ২০০৮ মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশে আরেকটি সংশোধনী এনে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের অধীনে নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধকে এর তফসিলভুক্ত করা হয়। এর ফলে নির্বাচনী অপরাধগুলো বিচার করার ক্ষমতা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে চলে যাবে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি হিসেবে জরিমানা অথবা দুই থেকে সাত বছর পর্যন্ত দণ্ডও দিতে পারবে। আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই বিধানের ফলে বিচার বিভাগ পৃথককরণ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে একমাত্র বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করতে পারেন এবং দণ্ড প্রদান করতে পারেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শুধু জরিমানা করার এখতিয়ারসম্পন্ন। এসব বিধান থাকা সত্ত্বেও ২৭ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করে। নির্বাচন কমিশন পূর্ত মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র লিখে অনুরোধ জানায়, তারা যেন সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে কমিশনের এরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার অনুমতি গ্রহণ করে। ৭ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বলে, তারা যেন নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপর ন্যস্ত করে। কিন্তু এদিকে সুপ্রিম কোর্ট পূর্ত মন্ত্রণালয়কে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা চর্চা করার অনুমতি দেয়।[৮]

এ বছর একটি মামলায় হাইকোর্ট বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণের বিষয়ে আরো ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সরকার কাজী হাবিবুল আওয়ালকে ভারপ্রাপ্ত আইন সচিব পদে নিয়োগ দেয়। একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এই নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করলে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দেন যে, এই নিয়োগ অস-াংবিধানিক ও অবৈধ। এই পদে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে কেন নিয়োগ দেয়া হয়নি তা জানানোর জন্যও হাইকোর্ট নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকার আপিল দায়ের করে, যা আপিল বিভাগে শুনানির

৭ *প্রাগুক্ত।*

৮ শাখাওয়াত লিটন, 'এসসি টু সেটেল হু টু ট্রাই পোল ওফেন্সেস: গভ. টু গো টু কোর্ট ফর লেটিং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটস ডু জব অব জুডিশিয়াল ওয়ান', *দি ডেইলি স্টার*, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮।

জন্য অপেক্ষমাণ।[৯]

অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়

অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি হওয়ার পর অ্যাটর্নি জেনারেল ফিদা এম কামাল পদত্যাগ করেন। এই অধ্যাদেশ অনুসারে অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলকে আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের অধীন করা হয়েছে।

আইন কমিশন

বিগত সরকারের সময় যেমন ছিল জরুরি অবস্থার মধ্যে কার্যত আইন কমিশন তেমনি অকার্যকর ছিল। কোনো আইন প্রণয়নের পূর্বে আইন কমিশনের পরামর্শ নেয়ার কোনো নজির এ বছর দেখা যায়নি।

পুলিশে সংস্কার

পুলিশ বাহিনীর জবাবদিহিতা ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালের পুলিশ আইনের পরিবর্তে নতুন একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।[১০] আইনের একটি খসড়াও দাঁড় করানোর পর সরকার তা জনগণের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।[১১] সাধারণ জনগণ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রতি আচরণবিধি, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, সমাজের সব নাগরিক, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা ইত্যাদিসহ অন্য অনেক বিষয়ে খসড়া অধ্যাদেশে পুলিশের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।[১২] ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আটককৃত ব্যক্তির অধিকারকে সম্মান প্রদর্শনের বিধানও রাখা হয়েছে খসড়া অধ্যাদেশে।[১৩] এখানে পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে এবং এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য আলাদা একটি কর্তৃপক্ষ তৈরির বিধান রাখা হয়েছে।[১৪]

---

৯ লেখকের কাছে সংরক্ষিত নথি।

১০ 'ড্রাফট অব পুলিশ অর্ডিন্যান্স ২০০৭ প্রিপেয়ারড', *নিউএজ*, ১০ এপ্রিল ২০০৮।

১১ 'গভ. ইনভাইটস পাবলিক ভিউ অন ড্রাফট পুলিশ অর্ডিন্যান্স', *বিডিনিউজ ২৪*, ২ ডিসেম্বর ২০০৮।

১২ ধারা ৩, খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭, দেখুন- *ííí.সযধ.মড়া.নফ/ঢ়ফভ/ঢ়ড়ষরপবড়ৎফ০৮.ঢ়ফভ.*

১৩ *প্রাগুক্ত*, ধারা ৪।

১৪ বিস্তারিত দেখুন : *আইন ও নীতিগত উন্নয়ন* বিষয়ক অধ্যায় ২।

নির্বাচন কমিশন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের যোগ্যতা কী হবে সে সম্পর্কিত কিছু নতুন শর্ত আরোপ করেছে নির্বাচন কামিশন। সেই সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের জন্যও কিছু শর্ত আরোপ করেছে।[১৫] বর্তমান শর্ত অনুসারে আদালত কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী,[১৬] অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, সেনাসদস্য বা অন্য কোনো সরকারি কর্মকর্তা অথবা কোনো বেসরকারি সংস্থার প্রধান অবসর গ্রহণের তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।[১৭] আবার ঋণখেলাপিসহ বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল, পয়ঃনিষ্কাশন বিল প্রভৃতি খেলাপিরাও নতুন আইন অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।[১৮] এ ধরনের কোনো ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদের জন্যও যোগ্য হবে না।[১৯] নৈতিকভাবে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব করা হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার কারণে তা বাস্তব রূপ নেয়নি। উল্লেখ্য, প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল থেকেই নৈতিক চরিত্রহীনতার (দুর্নীতি) দায়ে সাজাপ্রাপ্ত অনেকে আপিল দায়ের করার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ নেয়।[২০]

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ওপরও নির্বাচন কমিশন কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করে। এমন বিধিনিষেধ কোথাও কোথাও কঠোরভাবে পালন করা হলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ছিল শিথিল। অনেক রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত পূরণ না করেও নিবন্ধিত হয়েছে, এসব দলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগগুলো দ্রুততার সাথে

---

১৫ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি হয় ১৯ আগস্ট ২০০৮।

১৬ ধারা ১২(ক), গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ২০০৮।

১৭ *প্রাগুক্ত।*

১৮ *প্রাগুক্ত।*

১৯ *প্রাগুক্ত।*

২০ এমন উদাহরণ হলো– আওয়ামী লীগের সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর এবং বিএনপি সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। আরো বিস্তারিত দেখুন- *আইন ও নীতিগত উন্নয়ন* বিষয়ক অধ্যায় ২।

শুনানি করা হয়।[২১] অন্যদিকে আদিবাসীদের একটি দলকে নিবন্ধন দেয়া হয়নি।[২২]

নতুন প্রতিষ্ঠানের যাত্রা

সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন

অর্থ সংক্রান্ত অপরাধ বিশেষ করে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থকে বৈধতা দানের একটি পদ্ধতি হিসেবে এ বছর গঠন করা হয় সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন। সূত্র মতে, কমিশন কোটি কোটি অবৈধ অর্থ উদ্ধার করতে সমর্থও হয়েছে। তবে যে অধ্যাদেশের মাধ্যমে এই কমিশন গঠিত হয়, তা হাইকোর্ট কর্তৃক ১৩ নভেম্বর অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়। হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত আপিল বর্তমানে আপিল বিভাগে শুনানির অপেক্ষায় আছে।[২৩]

হিউম্যান রাইটস কমিশন

বছরের শেষ দিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। এর তিনজন কমিশনারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং একটি কার্যালয়ও বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো এটা পুরোপুরি কাজ শুরু করেনি। ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ মানবাধিকার কমিশন ফার্নিচারসহ উৎখাত হওয়ার সম্মুখীন হয়; কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঠিক সময়ে হস্তক্ষেপের ফলে তারা তাদের জন্য বরাদ্দকৃত স্থানেই থাকতে সমর্থ হয়েছে।[২৪]

তথ্য কমিশন

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি হয় ২০০৮ সালে। মন্ত্রিসভার কাগজপত্রসহ ২০ ধরনের তথ্যকে এই আইনের আওতা-বহির্ভূত করা হয়েছে (ধারা ৩)। এদিকে সরকারি গোপনীয়তা আইন এখনো বলবৎ আছে।

---

২১ 'জামাত স্কিপ ইসি'স ওয়ার ক্রাইম হেয়ারিং: ১১ ওরগানাইজেশনস সাবমিট প্রুফ, আস্ক নট টু রেজিস্টার জামাত অ্যাজ পার্টি', *দি ডেইলি স্টার*, ২ নভেম্বর ২০০৮।

২২ নাইম মোহাইমেন, 'চিটাগং হিল ট্রাকস অ্যান্ড মিসিং পাহাড়ি ভোট', *দি ডেইলি স্টার*, ১ ডিসেম্বর ২০০৮।

২৩ হাইকোর্টে রিট মামলাটি দায়ের করে মানবাধিকার সংগঠন অধিকার এবং অন্যরা। দেখুন *আইন ও নীতিগত উন্নয়ন* বিষয়ক অধ্যায় ২।

২৪ 'বিড টু রিমুভ এনএইচআরসি অফিস ফ্রম পিডব্লিউডি বিল্ডিং', *দি ডেইলি স্টার*, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮।

স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ২০০৮-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে একজন বিচার বিভাগীয় এবং একজন নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। এসব পরিবর্তন কতখানি ফলপ্রসূ হবে, তা বোঝা যাবে পরবর্তী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে।[২৫]

অনুবাদ : এটিএম মোরশেদ আলম

২৫ স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ২০০৮।